আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

শুভ্রজিৎ চক্রবর্তী

অবহেলা, অনাদর, বিস্মরণ—এইসব আত্মঘাতী শব্দমালা কখনই কোনও জাতির অহংকার বা অলংকার হতে পারে না। যে-সম্পন্ন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য আমরা বহন করে চলেছি তা বহুযুগের বহু মনীষীর সম্মিলিত সাধনায় এবং সচেষ্ট প্রয়াসে গড়ে উঠেছে। তাঁদের কাছে আমাদের ঋণ পরিশোধে নয়, স্বীকৃতিতেই পূর্ণতা পায়। তবু আমাদের সমাজকে ছুঁয়ে যায় বিস্মরণের অভিশাপ। আমরা ভুলে যাই সেইসব স্রষ্টাদের—যাঁদের ভুলে থাকায় কোনও গর্ব নেই, বরং জেগে থাকে গ্লানি, বেদনা আর মালিন্য। আর সেই পাপস্খালনের কারণেই বোধহয় শতবর্ষ, সার্ধশতবর্ষের আলোকোজ্জ্বল প্রহরকে খুঁজে নিই আমরা। আনুষ্ঠানিকতার বাধ্যবাধকতায় প্রাতিষ্ঠানিক চিন্তাচর্চার সূত্রে নতুন মূল্যায়ন আর মূল্যায়নপূর্ব ভূমিকাগুলোকে ফিরে দেখা চলে। কিছু পুনর্মুদ্রণ, অনুসন্ধান, কিছু গবেষণার ক্ষেত্র-প্রস্তুতির মধ্য দিয়ে বৌদ্ধিক সময় যাপন হয়। ব্যক্তি এবং ব্যক্তিত্বের অবদান নিয়ে চলে ধুনো জ্বালানো, পুজো অর্চনা, মাল্যদান। আবার হয়তো কোনও এক জয়ন্তীর প্রতীক্ষা।

প্রবন্ধের শুরুতেই এইরকম এক উপক্রমণিকা রচনার কারণ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী (১৮৬৪-১৯১৯)—যাঁর সমগ্র জীবনের লক্ষ্য ছিল বাংলা ভাষা এবং সংস্কৃতির সর্বাঙ্গীণ বিকাশ এবং প্রতিষ্ঠা। যিনি বলেছিলেন, ‘‘বাঙ্গালা সাহিত্যের ও তদ্দ্বারা স্বজাতির যথাসাধ্য সেবা করিয়া জীবন শেষ করি এই প্রার্থনা’’—সেই মানুষটিকে আজ আমরা কতটাই বা মনে রেখেছি! সাইবার-শাসিত যুগে মুঠোয় পাওয়া বিশ্বকে নিয়ে মেতে উঠেছি সবাই। অথচ ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে দাঁড়িয়ে এই বহুমুখী প্রতিভাধর মানুষটি দেশ এবং জাতিকে শিখিয়েছিলেন যুক্তিবোধের পরিশীলন, বিজ্ঞানচর্চায় এনেছিলেন নতুন জোয়ার। গভীর স্বদেশানুরাগে উদ্দীপ্ত করে তুলেছিলেন সমগ্র জাতিকে। বাংলা এবং বাঙালির ঐতিহ্যরক্ষায় নিজের সর্বস্ব সমর্পণ করেছিলেন। তিনি একাধারে বিজ্ঞানের মেধাবী ছাত্র এবং গবেষক। ‘বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ’ গঠনে অক্লান্ত কর্মী এবং সংগঠক। ছাত্রদরদি অসামান্য

শিক্ষক। মাতৃভাষায় বিজ্ঞানচর্চার অগ্রণী সৈনিক। বেদজ্ঞ পণ্ডিত। অসামান্য প্রাবন্ধিক। সাহিত্যের এবং দর্শনের বিভিন্ন শাখায় তাঁর অনুসন্ধিৎসু গবেষণা এবং পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হয়েছিল তৎকালীন বাংলার সুধিসমাজ। আর সুন্দর ব্যক্তিত্ব, নিরহংকারী স্বভাব তাঁকে লোকপ্রিয় করে তুলেছিল, সর্বত্রই নন্দিত এবং বন্দিত হয়েছিলেন তিনি। রবীন্দ্রনাথের বড়দাদা দার্শনিক দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর অকাল প্রয়াণের পর লিখেছিলেন, ''তাঁহার ন্যায় সদ্ভাবসম্পন্ন সাহিত্যানুরাগী, দেশহিতৈষী, সুবিদ্বান ও সুপণ্ডিত ব্যক্তি আমি... অতি অল্পই দেখিয়াছিলাম।

''তাঁহার বিশেষ গুণ ছিল—সত্যের প্রতি নিষ্ঠা এবং স্বাধীন চিন্তাশীলতা। তাঁহার সদ্ভাবপূর্ণ সুমধুর ও অকৃত্রিম সৌজন্য আমার হৃদয়ে জাগিতেছে। তাহা আমি কখনো ভুলিব না।''[১]

জীবনস্মৃতি

মন্দিরনগরী খাজুরাহোর পাশে এক প্রাচীন সম্পন্ন অঞ্চল, জেজাভুক্তি—চলিতে জেঝৌটি। ওই অঞ্চলে ব্রাহ্মণদের নাম জেজাভুক্তিয়া বা জিঝোটিয়া। এঁদেরই একজন ছিলেন হৃদয়রাম ত্রিবেদী। প্রায় সাড়ে তিনশো বছর আগে মুর্শিদাবাদের কান্দি মহকুমার ফতেসিংহ অঞ্চলে বসবাস শুরু করেন। তারপর তিনি চলে আসেন মুর্শিদাবাদের শক্তিপুরের কাছে টেন্ডা বা টেঁয়া বৈদ্যপুর গ্রামে। তাঁরা কর্ম এবং বিবাহসূত্রে 'জেমো' রাজবাড়ির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আবদ্ধ হন। সেই পরিবারেই জেমো গ্রামে ১২৭১ বঙ্গাব্দের ৫ ভাদ্র শনিবার জন্মগ্রহণ করেন রামেন্দ্রসুন্দর। বাবা গোবিন্দসুন্দর ত্রিবেদী, মা চন্দ্রকামিনী দেবী। গোবিন্দসুন্দর 'বঙ্গবালা' নামে একটি উপন্যাস রচনা করেন। পিতামহ ব্রজসুন্দর 'মাধব-সুলোচনা' নামে এক গদ্য-পদ্যময় নাটক, 'স্বর্ণসিন্দর সিংহ' বা 'গৌরলাল সিংহ' নামে একটি প্রহসনও রচনা করেছিলেন। কাকা উপেন্দ্রসুন্দরের সাহিত্যানুরাগও ছিল সুবিদিত।

গ্রামের পাঠশালাতেই তাঁর প্রাথমিক পড়াশুনার শুরু। ১৮৭৫ সালে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় জেলার মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করলেন তিনি। ১৮৭৬ সালে কান্দির উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে ১৮৮১ সালে এনট্রান্স পরীক্ষা দিলেন। পরীক্ষার কয়েকমাস আগে পিতৃবিয়োগের শোক মেনেই পড়াশুনা চালিয়ে তিনি প্রথম স্থান অধিকার করলেন। কাকার সঙ্গে কলকাতায় এসে ভর্তি হলেন প্রেসিডেন্সি কলেজে। ১৮৮৬ সালে বি এ পরীক্ষায় পদার্থবিদ্যা এবং রসায়নে অনার্স পেলেন। এবারও প্রথম। রসায়নের উত্তরপত্রের পরীক্ষক অধ্যাপক পেডলার ছাত্রের ভূয়সী প্রশংসা করে বলেছিলেন, 'Out and out the best'। পদার্থবিদ্যার এম এ পরীক্ষাতেও তিনি প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হন। ১৮৮৮-তে পান প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি। গবেষণা শুরু করেন প্রেসিডেন্সি কলেজে।

কিন্তু বিজ্ঞানের গবেষণায় পূর্ণ আত্মনিয়োগ করলেন না তিনি। কারণ তাঁর সামনে তখন স্বদেশ এবং স্বজাতির উন্নয়নের ক্ষেত্র। সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, ধর্ম, পুরাতত্ত্ব, পুরাণ, বেদ ইত্যাদি নানা বিষয়ে তাঁর আগ্রহ এবং কৌতূহল হয়তো কোনও সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে তাঁকে আবদ্ধ থাকতে দেয়নি।

বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর স্মৃতিতর্পণে শতপথ ব্রাহ্মণে বর্ণিত মৎস্য অবতারের প্রসঙ্গটির অবতারণা করেছিলেন হীরেন্দ্রনাথ দত্ত। নদীতে স্নান করতে গিয়েছেন ভগবান বৈবস্বত মনু। একটি ছোট মাছ গণ্ডূষে উঠে এল তাঁর। তিনি সযত্নে মাছটিকে বাড়িতে এনে ছোট একটি মাটির পাত্রে রাখলেন। কিন্তু ক্রমশ বড় হতে থাকা মাছটিকে ক্রমে জলাশয়, নদী হয়ে সমুদ্রে নিয়ে গিয়ে রাখতে হল।

শেষে যেদিন প্রলয়প্লাবনে প্লাবিত পৃথিবীর সব প্রাণীর জীবন বিপন্ন হল, সেই বিরাট মাছটির শৃঙ্গে দড়ি বেঁধে প্রাণ বাঁচালেন মনু। রামেন্দ্রসুন্দরও সেভাবেই বাংলা ভাষাকে সযত্নে রক্ষা করেছিলেন। নানা পশ্চিমি ঝঞ্ঝা, দুর্যোগ, আত্মজনের উপেক্ষা— সব বাধাকে অতিক্রম করে তিনিও বাংলা ভাষা এবং সংস্কৃতিকে রক্ষা করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন।

উনিশ শতকের শেষ দশক। জাতীয়তাবোধের উন্মেষে বাংলার সমাজ-রাজনীতি প্রোজ্জ্বল। একদিকে বঙ্কিমচন্দ্র যে-জাতীয়তা এবং স্বদেশবোধের চেতনা জাগিয়েছিলেন তার প্রভাব চলেছে। গিরিশচন্দ্র ঘোষের নাটক বাংলা রঙ্গমঞ্চ ছাড়িয়ে জনমনেও প্রভাব ফেলছে। বিজ্ঞানচর্চায় জগদীশচন্দ্র বসু এবং প্রফুল্লচন্দ্র রায় বিশ্বদরবারে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করছেন। অন্যদিকে শ্রীরামকৃষ্ণের আদর্শ বুকে নিয়ে বিশ্বজয় করে ফিরছেন স্বামী বিবেকানন্দ। প্রাচীনের অন্ধ আনুগত্য নয়, যুবসমাজ নতুন করে প্রাচীনকে বিচার করে নিচ্ছে সময়ের কষ্টিপাথরে। দেশের প্রতি, নিজের সভ্যতা-সংস্কৃতির শিকড় সন্ধানে উৎসাহী হয়ে উঠছে অনেকে। এভাবেই এল বিশ শতকের প্রথম দশক। বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনে মুখর বাংলা। বিপ্লবী কার্যকলাপ। উত্তপ্ত সমাজ-রাজনীতির প্রেক্ষাপট। এইসবের মাঝে দাঁড়িয়ে রামেন্দ্রসুন্দরও বুঝেছিলেন—''নানান্ দেশে নানান্ ভাষা/ বিনে স্বদেশী ভাষা পুরে কি আশা।'' তাই বিজ্ঞান আলোচনার ক্ষেত্রে তিনি ইংরেজির পরিবর্তে বাংলা ভাষাকে গ্রহণ করলেন। প্রয়োজনে পরিভাষা সৃষ্টি করে বাংলা ভাষাকে নতুন করে নির্মাণ করতে সচেষ্ট হলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দেওয়ার আমন্ত্রণও তিনি ফিরিয়ে দিয়েছিলেন, কারণ ইংরেজি নয়, তিনি বাংলা ভাষাতেই বক্তৃতা দিতে ইচ্ছুক ছিলেন। শেষ পর্যন্ত স্যার দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারীর আগ্রহে এবং ব্যবস্থাপনায় তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে 'যজ্ঞ' সম্পর্কে এবং 'বেদ' বিষয়ে বাংলায় বক্তৃতা দেন। রিপন কলেজে অধ্যাপনার সময়েও তিনি বাংলায় পাঠদান করতেন।

দেশাত্মবোধের দ্বারা চালিত রামেন্দ্রসুন্দর বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথের সহযোগী ছিলেন। অ্যানি বেসান্তের আহ্বানে অশক্ত শরীরেও তিনি ভারতসভায় উপস্থিত হন তাঁকে সমর্থন জানানোর জন্য। ভারতের অতীত গৌরবকে ফিরিয়ে আনতে তিনি প্রাচীন ভারতের পুরাতত্ত্ব, ইতিহাস, দর্শনচর্চায় মনোনিবেশ করেছিলেন এবং রচনার পর রচনায় সেই ভাবনাকে মেলে ধরেছিলেন। তাঁর ভাষা জনমনে উদ্দীপনা সঞ্চার করে ও দেশাত্মবোধ জাগিয়ে তোলে। লিখলেন, ''বন্দেমাতরম্। বাংলা নামে দেশ, তার উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে সাগর। মা গঙ্গা মর্ত্তে নেমে নিজের মাটিতে সেই দেশ গড়্লেন। প্রয়াগ, কাশী পার হয়ে মা, পূর্ব্ববাহিনী হ'য়ে সেই দেশে প্রবেশ কর্লেন। প্রবেশ ক'রে মা সেখানে শতমুখী হলেন। শতমুখী হ'য়ে মা সাগরে মিশলেন। তখন লক্ষ্মী এসে সেই শতমুখে অধিষ্ঠান কর্লেন। বাংলার লক্ষ্মী বাংলা দেশ জুড়ে বসলেন। মাঠে মাঠে লক্ষ্মী বিরাজ করতে লাগলেন।''

'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা' থেকে উদ্ধৃত অংশটি শুধু রামেন্দ্রসুন্দরের ভাবনার নয়, ভাষারও উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। বাংলা ভাগের দিন। স্থান জেমো-কান্দির নিজের বাড়ি। উপস্থিত প্রায় পাঁচশো নারী। তাঁর মায়ের আহ্বানে সকলে এসেছেন বিষ্ণুমন্দিরের উঠোনে। সেখানেই রামেন্দ্রসুন্দরের কন্যার মুখে এই ব্রতকথা প্রথম পঠিত হয়। সেখানে তিনি আরও লিখলেন, ''১৩১২ সাল, আশ্বিন মাসের তিরিশে, সোমবার, কৃষ্ণপক্ষের তৃতীয়া, সে দিন বড় দুর্দ্দিন, সেই দিন রাজার হুকুমে বাংলা দুভাগ হবে; দুভাগ দেখে বাংলার লক্ষ্মী বাংলা ছেড়ে যাবেন। পাঁচ কোটি বাঙালী আছাড় খেয়ে খেয়ে ভূমে গড়াগড়ি দিয়ে ডাকতে লাগ্ল—মা, তুমি বাংলার লক্ষ্মী, তুমি

বাংলা ছেড়ে যেয়ো না...। বাংলার মেয়েরা ঐদিন বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রত নিলে। ঘরে ঘরে সেদিন উনুন জ্বলবে না। হাতে হাতে হলুদ সুতোর রাখি বাঁধবে। বঙ্গলক্ষ্মীর কথা শুনে শাঁখ বাজিয়ে ঘটে প্রণাম ক'রে বাতাসা-পাটালি প্রসাদ পাবে।" আরও বললেন, ''মা লক্ষ্মী, কৃপা কর। কাঞ্চন দিয়ে কাঁচ নেবো না। শাঁখা থাকতে চুড়ি পর্‌বো না, ঘরের থাকতে পরের নেবো না।... মোটা অন্ন ভোজন কর্‌বো, মোটা বসন অঙ্গে নেবো, মোটা ভূষণ আভরণ কর্‌বো। পড়শীকে খাইয়ে নিজে খাব। ভাইকে খাইয়ে পরে খাব। মোটা অন্ন অক্ষয় হোক্। মোটা বস্ত্র অক্ষয় হোক্। ঘরের লক্ষ্মী ঘরে থাকুন। বাংলার লক্ষ্মী বাংলায় থাকুন।" এই কারণেই খগেন্দ্রনাথ মিত্র বলেছিলেন, ''রামেন্দ্রবাবুর মৃত্যুতে বঙ্গদেশ অকালে একজন মনস্বী কৃতী ও প্রতিভাবান্ সন্তান হারাইল। তিনি আপনাকে দেশের কল্যাণে নিবেদন করিয়া দিয়াছিলেন, তাঁহার সমস্ত চিন্তা এবং সাধনার মধ্যে শুধু একটি সুর বাজিয়া উঠিয়াছিল। জন্মভূমি এবং মাতৃভাষার কল্যাণ।"[২]

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সারথি

রামেন্দ্রসুন্দর উপলব্ধি করেন, জাতীয় ভাষা ও সাহিত্যের অনুশীলন না হলে জাতীয় ভাবের বিকাশ অসম্ভব। জাতীয় ইতিহাস উদ্ধার, বাংলার প্রত্নতাত্ত্বিক সম্পদের সংরক্ষণ, প্রাচীন সাহিত্য ও গ্রন্থের উদ্ধার এবং রক্ষণাবেক্ষণ, তার প্রকাশ এবং বাংলার প্রত্যন্ত স্থানে সাহিত্য, ইতিহাস ও অতীত গৌরবের অনুসন্ধানের জন্য সম্মিলিত প্রচেষ্টার প্রয়োজন তিনি অনুভব করেছিলেন। ১৩০১ সালের ১৭ বৈশাখ 'Bengal Academy of Literature' সভা পুনর্গঠিত হয়ে 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ' জন্ম নিল। তিনি সেদিন তাঁর স্বপ্নকে সাকার করার প্রত্যাশায় পরিষদের সঙ্গে যুক্ত হলেন। তারপর আমৃত্যু তাঁর জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য হয়ে উঠল পরিষদের শ্রীবৃদ্ধি। কখনও কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্য, কখনও পত্রিকার সম্পাদক, পরিষদের সম্পাদক বা সহকারী সভাপতির পদে থেকে তিনি সাহিত্য পরিষদের উন্নয়নে উল্লেখ্য ভূমিকা নেন। মৃত্যুর ছয় দিন আগে তিনি সভাপতি হিসেবে মনোনীত হন। বৈজ্ঞানিক ও প্রাবন্ধিক হিসেবে রামেন্দ্রসুন্দর তাঁর প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ ঘটাতে পারেননি। সেজন্য অনেকেই পরিষদকে নিয়ে তাঁর ব্যস্ততাকেই দায়ী করেন। এ-নিয়ে সে-যুগের বিশিষ্টজনেরা তামাশাও করতেন। রামেন্দ্রসুন্দরের দৌহিত্র ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায় তাঁর 'ঘরে-বাইরে রামেন্দ্রসুন্দর' গ্রন্থে এক মজার ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন। রামেন্দ্রসুন্দরের কাছে তিনি জেনেছিলেন 'পরিষদ' স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ। পরিষদের ভবন উদ্বোধনের দিন কৌতুক করে তিনি বলেন, ''একে কে বিয়ে করতে আসবে?" শুনে 'বিশ্বকোষ প্রণেতা প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব' নগেন্দ্রনাথের একটুকরো হাসি; তারপরেই মাথা দুলিয়ে কিস্তিবন্দি উত্তর : ''আর আসবে কী? তোমার নানার সঙ্গেই তো বিয়ে হয়েছে। যাও না, তাঁকেই জিজ্ঞেস করে এস। একেও দ্বিতীয়পক্ষের নানী বলতে পার।"[৩]

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ও একথা মানতেন। রামেন্দ্রসুন্দরের বন্ধু 'ঠাকুরানীর কথা'র লেখক ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বলতেন, ''পরিষদের কেরাণীগিরি করিয়াই রামেন্দ্র মরিল।"[৪]

'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ' যথার্থই ছিল তাঁর জীবনের এক আদর্শ এবং স্বপ্ন। সাহিত্য সম্মেলন ছাড়া যে এই স্বপ্ন বাস্তবায়িত হবে না তা তিনি বুঝেছিলেন, তাই বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের মাধ্যমে বাংলার সর্বত্র তিনি জাতীয় চেতনার প্রচার ও প্রসার ঘটাতেও সচেষ্ট হয়েছিলেন। ১৩১৪-তে বহরমপুরে, ১৩১৫-য় রাজশাহীতে, ১৩১৭ সালে ভাগলপুরে সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পরিচালনায় এরপরেও এই

সাহিত্য সম্মেলন বাংলার জনমনে জাতীয় চেতনার জাগরণে এবং হারানো অতীতের প্রতি মানুষকে সচেতন করে তুলতে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিল।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের নিজস্ব কোনও ঠিকানা ছিল না। ব্যোমকেশ মুস্তাফির সঙ্গে রামেন্দ্রসুন্দর পরিষদের নিজস্ব ভবন নির্মাণের উদ্যোগ নিলেন। কাশিমবাজারের রাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী জমি দান করলেন। শুরু হল নির্মাণ। অর্থসংগ্রহের জন্য আরও অনেকের সঙ্গে প্রবল উদ্যমে ঝাঁপিয়ে পড়লেন তিনি। বাংলার সুধিসমাজ এ-উদ্যোগকে স্বাগত জানালেন। আচার্য জগদীশচন্দ্র লিখলেন, ''অন্তর্দৃষ্টিতে দেখিলে দেখিতে পাইব, সাহিত্য-পরিষৎ সাধকদিগের সম্মুখে দেবমন্দির রূপেই বিরাজমান। ইহার ভিত্তি সমস্ত বাঙ্গালাদেশের মর্মস্থলে স্থাপিত, এবং ইহার অট্টালিকা আমাদের জীবন স্তর দিয়া রচিত হইতেছে।''[৫]

শুধুমাত্র প্রতিষ্ঠান স্থাপন নয়। প্রতিষ্ঠান পরিচালনা নিয়ে বাস্তবসম্মত ভাবনা ছিল তাঁর। ১৯০৩ সালে কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের পর রিপন কলেজের অধ্যক্ষ হন রামেন্দ্রসুন্দর। কাজেই প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা তাঁর ছিল। লালগোলার মহারাজা যোগীন্দ্রনারায়ণ প্রায় সত্তর হাজার টাকা পরিষদের উন্নয়নে দান করেন। রামেন্দ্রসুন্দরের উদ্যোগে সংগৃহীত এই টাকাতেই পরিষদ বিদ্যাসাগরের পুস্তকাগারের গ্রন্থগুলি কিনে নিল। ঋণের দায়ে এই মহামূল্য সামগ্রী নিলামে ওঠার আগেই তার যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণে উদ্যোগী হলেন তিনি। ১৩১৬ বঙ্গাব্দে পরিষদের চিত্রশালা (Museum) প্রতিষ্ঠা, প্রত্নতাত্ত্বিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কে তার দায়িত্ব অর্পণ করা—সবকাজেই তিনি অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করলেন। প্রশাসনিক কাজকর্ম পরিচালনাতেই তিনি নিমগ্ন থাকতে চেয়েছিলেন। পদের বিন্দুমাত্র লোভ বা মোহ তাঁর ছিল না। তাঁকে পরিষদের সভাপতির পদ গ্রহণে অনুরোধ করা হলে তিনি লিখেছিলেন, ''আমি চিরজীবন পরিষদের সেবকের কার্য্য করিয়া যাইব, ইহাই আমার জীবনের আকাঙ্ক্ষা—পরিষদের নেতৃত্ব গ্রহণ আমার কাজ নহে।''[৬]

তাঁর ব্যক্তিত্বের আকর্ষণ সে-যুগের বাঙালিসমাজ উপেক্ষা করতে পারেনি। বিনয়, পারস্পরিক শ্রদ্ধা, অকৃত্রিম দেশানুরাগ, কোমলতা, উদারতা, অহংকারশূন্যতা অথচ বিচক্ষণতা, কর্মোদ্যোগ অথচ শান্তিপ্রিয়তা—এতসব মানবিক গুণের একত্র সমাবেশ ঘটেছিল তাঁর মধ্যে। সেসময় প্রায় মৃত্যুমুখে পতিত, রোগজর্জর দীনেশচন্দ্র সেন। 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' সদ্য প্রকাশিত হয়েছে। ১৮৯৬, ডিসেম্বর মাস। কুমিল্লায় রানির দিঘির পাড়ে কষ্টের দিনযাপন চলছে। তাঁকে কলকাতায় নিয়ে এলেন। দীনেশচন্দ্র সেন লিখেছেন, ''কতদিন শয্যাপার্শ্বে আমার চিরপ্রফুল্ল বন্ধুর মুখখানি দেখিয়াছি।... তিনি আমার সে সময়ের দুরবস্থা দেখিয়া দ্বারে দ্বারে আমার জন্য ভিক্ষা করিয়াছেন; কিন্তু কি করিয়াছেন তাহা আমাকে জানিতে দেন নাই।''[৭] তাই তাঁর পঞ্চাশ বছরের জন্মদিন উপলক্ষ্যে আয়োজিত সভায় রবীন্দ্রনাথ সবাইকে লিখে শোনালেন—''তোমার হৃদয় সুন্দর, তোমার বাক্য সুন্দর, তোমার হাস্য সুন্দর, হে রামেন্দ্রসুন্দর, আমি তোমাকে সাদর অভিবাদন করিতেছি।''

তিনি নিজেই বলেছিলেন, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সঙ্গে তাঁর 'সেব্য-সেবক সম্পর্ক'। অসুস্থ শরীরেও তিনি পরিষদের সেবায় নিজেকে নিমগ্ন রেখেছিলেন। রিপন কলেজ থেকে সেখানকার দপ্তরে প্রতিদিন পৌঁছে যেতেন। অর্থসংগ্রহ থেকে নতুন প্রকাশনা এবং অনুসন্ধান—সব বিষয়ে তাঁর উৎসাহ ছিল। আর ছিল সবাইকে সঙ্গে নিয়ে চলার আশ্চর্য ক্ষমতা। পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সঙ্গে পরিষদের সাময়িক বিচ্ছেদ তাঁর উদ্যোগেই দূর হয়। বাংলা তথা বাঙালির ভবিষ্যতকে ঐতিহ্যের শক্ত

ভিতের উপর প্রতিষ্ঠিত করে দিয়ে গিয়েছিলেন রামেন্দ্রসুন্দর।

প্রবন্ধসাহিত্যের বৈঠকখানায়

উনিশ শতকের শেষ, বিশ শতকের শুরু। বাংলা গদ্য বঙ্কিম যুগ পেরিয়ে এগিয়ে গিয়েছে বেশ খানিকটা। ইতিমধ্যে স্বামী বিবেকানন্দের রচনায় সাধুরীতির গদ্যের বদলে চলিত রীতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রমথ চৌধুরীর 'সবুজপত্র' তখনও বীজাকারে সুপ্ত। অক্ষয়কুমার দত্ত, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, ভূদেব মুখোপাধ্যায় এবং বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যুক্তিনিষ্ঠভাবে বিজ্ঞান এবং দর্শনের গম্ভীর বিষয় আলোচনা করেছেন। ভাব এবং বিষয়ের সঙ্গে সংগতি রেখে তাঁদের ভাষা রীতি ও গাম্ভীর্যের দ্যুতি হারায়নি।

গুরুগম্ভীর, তথ্যপূর্ণ, জটিল সেই প্রবন্ধ-সাহিত্যের দরবারি ভাষাকে সরসভাবে বৈঠকি ভঙ্গিতে হাস্যপরিহাস সহযোগে পরিবেশন করলেন রামেন্দ্রসুন্দর। মুখের ভাষার ওপর ভিত্তি করে রচিত হলেও তা বিষয়ানুগ এবং যুক্তিপরম্পরার ভারবহনে উপযোগী। পরবর্তী কালে তাঁর ভাষারীতির বিশিষ্টতা সমালোচক মহলেও সমাদৃত হয়েছিল। বিশিষ্ট সমালোচক যথার্থই বলেছিলেন,

''একটি ঘরোয়া পরিবেশ সৃষ্টি করেই প্রাচীন ভারতীয় উপমা ও বিশেষণের দ্বারাই নিজ বক্তব্যকে প্রাঞ্জলরূপে উপস্থিত করতে চেয়েছেন। বাগ্‌বৈভব রামেন্দ্র গদ্যরীতিতে নেই, আছে প্রাঞ্জলতা এবং প্রসাদগুণ। এই গদ্যরীতিতে এমন একটি অনায়াস স্বাচ্ছন্দ্য ও সাবলীলতা আছে যা মুহূর্তের মধ্যেই পাঠকচিত্তকে প্রসন্ন করে তোলে।''[৮]

বিজ্ঞানের মেধাবী ছাত্র রামেন্দ্রসুন্দর। বৈজ্ঞানিক বিষয়ে তাঁর জ্ঞান প্রগাঢ়। কিন্তু বিজ্ঞানবিষয়ক প্রবন্ধ রচনা করতে বসে বিজ্ঞানের কঠিন-জটিল তত্ত্ব এবং বিষয়কে যেভাবে তিনি উপস্থাপন করলেন তা যথার্থই অসামান্য। সহজবোধ্য এবং উপভোগ্য তাঁর গদ্যরীতি—

''লেজটা কোনরূপে লুপ্ত হইলে বানর বনমানুষে দাঁড়ায় এবং বনমানুষ একটুকু চিকন হইলে মানুষ হইতে তাহার বড় বিলম্ব থাকে না।... বানরের লেজ গেলে সে মানুষ হইবে; কিন্তু লেজ যাবে কি রূপে? কুমীরের বা টিক্‌টিকির সম্মুখের পা দুখানাকে ডানায় পরিণত করিতে পারিলে পাখী হইবে বটে; কিন্তু পা দুখানা ডানায় পরিণত হইবে কি রূপে?

''এই 'কি রূপে' প্রশ্নটার উত্তর দিতে সহজে কেহ সাহসী হন নাই। ফরাসী প্রাণি-তত্ত্ববিদ্ লামার্ক এই প্রশ্নের উত্তর দিবার চেষ্টা করেন।'' (মৃত্যু, প্রকৃতি)

বিজ্ঞানবিষয়ে প্রবন্ধরচনার মধ্য দিয়েই বিজ্ঞানের গবেষক অধ্যাপক রামেন্দ্রসুন্দরের সাহিত্যচর্চার সূত্রপাত ঘটে। অক্ষয়চন্দ্র সরকার সম্পাদিত 'নবজীবন' মাসিক পত্রিকায় তাঁর বিজ্ঞান বিষয়ক প্রথম নিবন্ধটি প্রকাশিত হয়। বিবিধ বিষয়ের প্রতি আগ্রহ তাঁর জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রটিকে প্রসারিত করেছিল। বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, সংস্কৃতি, সাহিত্য, পুরাণ, বেদ ইত্যাদি নানা বিষয়ে তাঁর অনায়াস পাণ্ডিত্য ছিল। যার প্রকাশ ঘটেছিল অসংখ্য প্রবন্ধে। আর এইসব প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল 'জন্মভূমি', 'সাহিত্য', 'ভারতী', 'মানসী ও মর্ম্মবাণী', 'বঙ্গদর্শন', 'প্রবাসী', 'ভারতবর্ষ', 'প্রদীপ' এবং অবশ্যই 'সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা' প্রভৃতি সাময়িক পত্রে।

রামেন্দ্রসুন্দর বিজ্ঞানী। বিজ্ঞান বিষয়ে তাঁর আলোচনা তাই গভীর এবং বিশ্লেষণধর্মী। তথ্য এবং তত্ত্বের প্রতি বৈজ্ঞানিকসুলভ নিষ্ঠার সঙ্গে রসগ্রাহী মনের সরস উপস্থাপন প্রবন্ধগুলিকে মানুষের মনের কাছাকাছি পৌঁছে দিয়েছিল। 'প্রকৃতি' গ্রন্থের (১৮৯৬) প্রবন্ধগুলি ডারউইন, হ্যাক্সলি, ল্যামার্ক,

ক্লিফোর্ড প্রভৃতি বিজ্ঞানীদের আলোচিত তত্ত্বের বিশ্লেষণের উপর গড়ে উঠেছে। 'সৌরজগতের উৎপত্তি', 'প্রাকৃত সৃষ্টি', 'পৃথিবীর বয়স', 'প্রলয়', 'মৃত্যু', প্রতিটি তাঁর বিশিষ্ট বিজ্ঞানভাবনার আলোকে আলোকিত। 'প্রকৃতি' গ্রন্থের 'আকাশ তরঙ্গ' প্রবন্ধে তিনি লেখেন,

''আমাদের প্রাচীন পণ্ডিতেরা আকাশ নামে একটা সূক্ষ্ম পদার্থের অস্তিত্ব কল্পনা করিয়াছিলেন; পদার্থটা তাঁহাদের মতে বিশ্বব্যাপীও ছিল। সুতরাং ঈথর শব্দের অনুবাদে আমরা আকাশ বসাইতে পারি।... আকাশের যে ঢেউগুলি আমাদের আলোক জ্ঞান জন্মায়, তাহার এক একটির দৈর্ঘ্য এত ছোট যে জলের ঢেউ এর সঙ্গে তার তুলনাই হয় না। তাহাদের দৈর্ঘ্য মাপিতে গেলে ইঞ্চিতে আর চলে না। ইঞ্চিকে কোটি ভাগ করিতে হয়।... যে ঢেউগুলি একটু লম্বা তাহাতেই লাল আলো দেয়; তার চেয়ে আর একটু লম্বা হইলে আর আমাদের চোখ ধরিতে পারে না। মাঝারি রকমের ঢেউগুলির মধ্যে কোনটা হলদে, কোনটা সবুজ, কোনটা নীল দেয়। আর ছোট হইলে আমরা বেগুনি রং দেখি।''

'প্রকৃতি', 'বিচিত্র জগৎ', 'জগৎ কথা' এই গ্রন্থগুলিতে মূলত রামেন্দ্রসুন্দরের বৈজ্ঞানিক চিন্তা-চেতনার প্রকাশ ঘটেছিল। জড় ও জীবের সম্পর্কসূত্রের অনুসন্ধান তিনি করেছিলেন তাঁর 'বিচিত্র জগৎ' প্রবন্ধ গ্রন্থটিতে :

''ব্যবহারিক জগৎ যেন একখানা drama; উহার একটা plot আছে, একটা end আছে, গোড়ায় একটা design আছে,—অঙ্কের পর অঙ্ক, একটা উদ্দেশ্য purpose লইয়া আসে, কেহই নিরর্থক আসে না। আর প্রাতিভাসিক জগৎ যেন একটা Epic poem, ঘটনাবহুল উচ্ছৃঙ্খল; সর্বত্রই একটা উলট্ পালট্, বিপর্য্যয় ও বিপ্লবের কাণ্ড। দেখিলে তাক্ লাগে; হাসিতে হয়; কাঁদিতে হয়; অভিভূত হইতে হয়;...।''

এই সরস উপস্থাপনই রামেন্দ্রসুন্দরের কৃতিত্ব। বিজ্ঞানকে সাহিত্যরসে জারিত করে জনমনে বিজ্ঞানের সত্যকে প্রতিষ্ঠা—বাংলাভাষায় এই দুরূহ কাজটির তিনি সূত্রপাত ঘটান।

রামেন্দ্রসুন্দরের 'জিজ্ঞাসা' গ্রন্থটি মুখ্যত তাঁহার দার্শনিক প্রবন্ধের সমষ্টি। চরম সত্যকে অনুসন্ধান করছেন একজন বৈজ্ঞানিক। বিজ্ঞানীসুলভ স্বচ্ছ বিচারশীল মন, যুক্তিবাদী মানসিকতা নিয়ে তিনি প্রবেশ করেছিলেন দর্শনের জগতে। বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক রামেন্দ্রসুন্দরের দৃষ্টি কিন্তু কোনও তত্ত্বব্যাখ্যায় নিবদ্ধ ছিল না। জগৎ ও জীবনের মৌলিক সমস্যার সমাধানই ছিল তাঁর মূল লক্ষ্য। গভীর বিশ্লেষণী শক্তি এবং রসগ্রাহী মনের সংমিশ্রণে গড়া তাঁর চেতনা। তাই তাঁর দার্শনিক চিন্তার প্রতিফলনেও হাস্যরসের প্রাদুর্ভাব লক্ষ করা যায়। দার্শনিক তত্ত্বকে তিনি যেভাবে সহজ ভাব এবং ভাষায় ব্যক্ত করেছিলেন তা যথার্থই অতুলনীয়।

''বেদান্ত যাহাকে ব্রহ্ম বলেন, তিনি আর কেহ নহেন, তিনি আমি—সোঽহম্—অহং ব্রহ্মাস্মি।... বিশুদ্ধাদ্বয়বাদী শঙ্করাচার্য বেদান্তবাক্যের যে এই অর্থ বুঝিয়াছিলেন, তাহা সহস্র স্থল হইতে তাঁহার বাক্য উদ্ধৃত করিয়া দেখান যাইতে পারে। আত্মা অর্থে আমি, ইংরাজীতে যাহাকে Ego বলে বা Self বলে তাহাই; এবং আমার অপর নাম ব্রহ্ম। এই ব্রহ্মাকে যদি পরমাত্মা বলিতে চাও, আমি সেই পরমাত্মা; ইহাই বিশুদ্ধ অদ্বৈতবাদ—ইহাই জীব ব্রহ্মের অভেদবাদ।'' বেদান্ত নিয়ে তাঁর এই ভাবনায় অনেকেই স্বামী বিবেকানন্দের প্রভাব লক্ষ করেছেন। এভাবেই দর্শনের সহজ বিশ্লেষণ তাঁর দার্শনিক প্রবন্ধগুলিকে বিশেষ মাত্রায় উন্নীত করেছিল। শুধুমাত্র ভারতীয় দর্শন নয়, বৌদ্ধদর্শন, ডারউইনের অভিব্যক্তিবাদ, সোপেনহাওয়ার ও হার্টম্যানের দুঃখবাদ, হিউম ও হাক্সলির মতবাদ,

ভারতীয় দার্শনিকদের নির্বাণতত্ত্ব, বৈষ্ণবীয় দর্শন—সর্বত্রই তাঁর কৌতূহলী মন পরিভ্রমণ করেছিল। সাধারণভাবে তিনি অদ্বৈতবাদী, কিন্তু নিঃসংশয়ে তাকে গ্রহণ করতে পারেননি।

আসলে বৈজ্ঞানিক সত্যের মধ্যে চিরন্তন মানবজীবনের সত্যকে প্রত্যক্ষ করতে পারেননি তিনি। তিনি বিজ্ঞানের জগতের অধিবাসী হয়েও উপলব্ধি করেছিলেন যে বিজ্ঞান মানুষকে চরম পরিণতির পথে চালিত করতে পারে না। তিনি লিখেছিলেন,

''ফলে যে সকল জাগতিক সত্য লইয়া আমরা স্পর্ধা করি ও তাহাদিগকে সনাতন সার্বভৌমিক সত্য বলিয়া নির্দেশ করি, মূল অন্বেষণ করিলে দেখা যাইবে, উহারা সর্বত্রই আমাদের মনঃকল্পিত সত্য। সত্যরূপী পরমদেবতা কোথায় কীভাবে আছেন আমরা জানি না; আমরা কেবল 'উপাসকানাং সিদ্ধ্যর্থকং' কতকগুলা মনগড়া পুতুল স্বহস্তে নির্মাণ করিয়া প্রতিষ্ঠা করিয়াছি এবং ঢাক-ঢোল বাজাইয়া তাহাদের পূজা করিতেছি।'' (বিজ্ঞানে পুতুলপূজা)

সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিক রামেন্দ্রসুন্দরের রচনার মধ্যে তিনটি সত্তারই প্রকাশ ঘটেছিল। 'কর্ম্মকথা' গ্রন্থে প্রাচীন ভারতের কর্মবাদকে যেভাবে তিনি বিশ্লেষণ করলেন তা বিস্ময়কর। ব্যক্তিমানুষের ব্যক্তিত্ববোধ উন্মেষে তার কর্মগত স্বাধীনতা এবং সামাজিক চৈতন্যের যে-গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা—তাই তিনি 'বৈরাগ্য', 'জীবন ও ধর্ম্ম', 'ধর্ম্মের জয়' প্রভৃতি প্রবন্ধে ব্যক্ত করে গেছেন। বেদের কর্মকাণ্ড এবং জ্ঞানকাণ্ডের ধারণা কীভাবে গীতায় সমন্বিত হয়েছে তার অপূর্ব ব্যাখ্যাও তিনি করেছিলেন 'শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা' প্রবন্ধটিতে।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অধ্যাপক ম্যাক্সমুলার প্রমুখ দেশি-বিদেশি ব্যক্তিত্বের মহত্ত্ব এবং চিন্তাচেতনার পরিচয় উন্মোচিত করেছিল তাঁর 'চরিতকথা' গ্রন্থ। 'নানা কথা' গ্রন্থে শিক্ষা, রাষ্ট্রব্যবস্থা এবং সাহিত্য আলোচনার নতুন দিগন্ত খুলে দিলেন। 'ইংরাজি শিক্ষার পরিণাম', 'শিক্ষাপ্রণালী' প্রবন্ধগুলিতে তাঁর শিক্ষাবিষয়ক বিশিষ্ট ভাবনার পরিচয় মেলে। 'সাহিত্য কথা' এবং 'মহাকাব্যের লক্ষণ' তাঁর সাহিত্যবিষয়ে গভীর অনুধ্যান, বিস্তৃত জ্ঞান, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সাহিত্যের সঙ্গে নিবিড় পরিচয়ের সাক্ষ্য বহন করে। 'শব্দকথা' রচনাটি আবার পরিভাষা প্রণয়নে তাঁর অসামান্য কৃতিত্বের পরিচয়।

কথাশেষ

বাঙালির সর্বাঙ্গীণ বিকাশ ছিল রামেন্দ্রসুন্দরের জীবনের লক্ষ্য। দেশকে উন্নত করতে হলে দেশের মানুষের মন এবং মননকে উন্নত করতে হবে। সেজন্য দেশের ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি প্রয়োজন। মহৎ ভাব, আধুনিক উন্নত চেতনা, দেশানুরাগ যদি জাতির মনে না অনুভূত হয়, তাহলে সে-জাতি পৃথিবীর বুকে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে না। এ-ভাবনাতেই চালিত হয়েছিলেন তিনি। সেই সময়ও তাঁর কাছে সেই ভাবনার অনুশীলনের উপযোগী বাতাবরণ সৃষ্টি করেছিল। বিশ্বসভায় ভারত তথা বাংলার জয়জয়কার তখন। স্বামী বিবেকানন্দ, আচার্য জগদীশচন্দ্র, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ নিজ নিজ ক্ষেত্রে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করছেন। বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলন এগিয়ে চলেছে তীব্রগতিতে। গতি পাচ্ছে ইংরেজবিরোধী মানসিকতার প্রসার। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, অতুলপ্রসাদ, মুকুন্দদাস বাংলার ঘরে ঘরে পৌঁছে দিচ্ছেন স্বদেশপ্রেমের সুর। ইস্টইয়র্ক রেজিমেন্টকে হারিয়ে আই এফ এ শিল্ড জিতে নিয়েছে মোহনবাগান। সেই আন্দোলনমুখর সময়ে

জাতির মনে বিজ্ঞানবোধ, উচ্চ দার্শনিক চেতনা, ইতিহাস-চেতনার জন্ম দিয়েছিলেন তিনি। বিজ্ঞানের কৃতী ছাত্র হয়েও গবেষণাগারেই কাটিয়ে দেননি সারা জীবন।

আসলে দেশ-জাতির উন্নতি ছিল তাঁর স্বপ্ন; সেই স্বপ্নের বাস্তবায়নই ছিল তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য। ''পরের জন্য আত্মবিসর্জন ভিন্ন পৃথিবীতে স্থায়ী সুখের অন্য কোন মূল্য নাই''—বলেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। সেই আদর্শকেই জীবনের ধ্রুবসত্য বলে গ্রহণ করেছিলেন রামেন্দ্রসুন্দর। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের কর্মযজ্ঞে নিজেকে সর্বতোভাবে নিয়োগ করেছিলেন। এই আত্মনিয়োগ কি তাঁর ব্যক্তিগত জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি? যে-প্রখর মেধা-মনন এবং বোধশক্তির অধিকারী ছিলেন তিনি তার পূর্ণ বিকাশ কি সত্যি ঘটেছিল? সংগত কারণেই এই প্রশ্ন আমাদের বিচলিত করে। আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু লিখেছিলেন, ''আমাদের দুঃখ হয় 'বিদ্যার এত বড় জাহাজ' থেকে কোন চিরস্থায়ী সম্পদ নামানো সম্ভব হল না। তাঁর রচনাবলী বেশীরভাগ সাময়িকীতে প্রকাশিত জনপ্রিয় মুখরোচক প্রবন্ধে ভরা।''[৯]

এই আক্ষেপ অনেকেরই ছিল। বিশেষত রিপন কলেজের চার দেওয়ালে নিজেকে বদ্ধ রেখেছিলেন তিনি আজীবন। অথচ বিশ্ববিদ্যালয়ে অনায়াসেই যোগ দিতে পারতেন তিনি। এমনকী বিশ্ববিদ্যালয়ের সায়েন্স কলেজে তাঁকেই প্রধান হিসেবে নিয়োগ করতে চেয়েছিলেন আশুতোষ মুখোপাধ্যায় স্বয়ং। কিন্তু কোনও রহস্যময় কারণে তিনি সেখানে যোগ দিতে চাইলেন না। বহু ঝড়ঝাপ্‌টা সামলে তিনি রিপন কলেজকে দৃঢ় ভিত্তি দিলেন। বিজ্ঞান বিভাগ চালু করলেন। যাবতীয় প্রশাসনিক জটিলতা সামলালেন।

অত্যধিক পরিশ্রম, প্রিয়জনের বিয়োগব্যথায় কাতর রামেন্দ্রসুন্দরের স্বাস্থ্য ধীরে ধীরে ভেঙে গেল। 'Bright disease' নামে এক রোগে ক্রমশ হারিয়ে ফেললেন জীবনের স্পন্দন। তাঁর শেষ ইচ্ছা পূর্ণ করতে তাঁর বাড়িতে এসেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। রামেন্দ্রসুন্দরের অনুরোধে পড়ে শোনালেন 'নাইট' উপাধি বর্জনের চিঠিটি। আপ্লুত রামেন্দ্রসুন্দর, চাইলেন রবীন্দ্রনাথের পদধূলি। কিন্তু অসুস্থ তিনি, মাথা তোলার শক্তি হারিয়ে ফেলেছেন। তীব্র অনিচ্ছা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ বাধ্য হলেন রামেন্দ্রের শেষ ইচ্ছা পূরণে—তুলে দিলেন পা দুখানি রামেন্দ্রসুন্দরের মাথার কাছে। পূর্ণ হল তাঁর শেষ ইচ্ছা। বিদায় নিলেন রবীন্দ্রনাথ। তন্দ্রায় অভিভূত হলেন রামেন্দ্রসুন্দর। সে-তন্দ্রা আর ভাঙল না। ✠

তথ্যসূত্র

১। সম্পাদনা : শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, *আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর* (ডি এম লাইব্রেরী : কলকাতা, ১৩৬৫) পৃঃ ৫২ [এরপর, *আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর*]

২। তদেব, পৃঃ ৬৫

৩। শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়, *ঘরে বাইরে রামেন্দ্রসুন্দর* (ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিমিটেড : কলকাতা, ১৮৮১ শকাব্দ), পৃঃ ৪৪-৪৫

৪। তদেব, পৃঃ ৪৫

৫। *আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর*, পৃঃ ১৫৮

৬। তদেব, পৃঃ ১৬১

৭। তদেব, পৃঃ ৩৫

৮। অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, *বাংলা গদ্যের শিল্পিসমাজ* (শান্তি লাইব্রেরী : কলকাতা, ১৩৬৪), পৃঃ ১১০

৯। *সত্যেন্দ্রনাথ বসু রচনা সংকলন* (বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ : কলকাতা, ১৪০৫), পৃঃ ১৮৮